উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার ২৮ ভাদ্র ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ১১৮ সংখ্যা

গোড়ায় গলদ

দুই পক্ষের হাতেই মোক্ষম অস্ত্র এসেছে। ব্যাংকের টাকা গায়েব করায় অভিযুক্ত মদিরা সম্রাট বিজয় মালিয়া বলেছেন, দেশ ছাড়ার আগে তিনি অর্থমন্ত্রী জেটলির সঙ্গে দেখা করে মীমাংসার কথা বলে এসেছেন। এটা বিরোধীদের অস্ত্র। আবার রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, অনাদায়ি ঋণের উৎস ইউপিএ আমলে। এটা সরকার পক্ষের অস্ত্র। মজার বিষয় হল, এমন দুই অস্ত্র কোনো মহারথীই জুতসইভাবে ব্যবহার করছেন না। তারা যেন স্ববিরোধী। কারণ, দু-পক্ষেরই সাফাইয়ে বিস্তর গলদ রয়েছে। তাই প্রকৃত তথ্য চেপে বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে দু-তরফে।

বিষয় দুটি জনমানসে বিতর্কের আওতায় অবশ্যই আসবে। বুধবার লন্ডনে ওয়েস্ট মিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেট মালিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া সংক্রান্ত মামলার শুনানির বিরতিতে ৯ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করে পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া একটি মোক্ষম তির ছুড়েছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, তিনি ভারত ছাড়ার আগে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছোতে অরুণ জেটলির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। অর্থমন্ত্রী বৈঠকের কথা স্বীকার না করলেও লোকসভার লবিতে সাক্ষাতের কথা মেনে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, তিনি মালিয়াকে ব্যাংকারদের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। জেটলির কথায় স্পষ্ট, সাক্ষাৎ এবং সাক্ষাতের বিষয়বস্তু তাঁর অজানা নয়। কারণ, তাঁকে আগেই জানানো হয়েছিল, মালিয়া ধাপ্পা দেওয়ার প্রস্তাব দেবেন। জেটলির কথায়, হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, মালিয়া তাঁর কক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার জন্য যদি কেউ হঠাৎ অর্থমন্ত্রীর ঘরের দিকে পা বাড়ান তবে তাঁকে তো নেহাত আনাড়ি বলতে হয়। যিনি অতীব ধূর্ততায় ব্যাংকের টাকা গায়েব করায় অভিযুক্ত, তাঁকে এতই কাঁচা লোক ভাবার কি কোনো কারণ আছে? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, জেটলির সাফাই সাদামাটা তা হলেও যে বড়ো মাপের প্রশ্ন উঠে আসে তা হল, তিনি বিজয় মালিয়াকে নিয়ে তোলপাড় ওঠার সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ছোট্ট তথ্যটি দেননি কেন? বিশেষ করে বিজয় মালিয়া সম্পর্কে রেড কর্নার নোটিশ জারিতে ৮৮ ঘন্টারও বেশি অহেতুক কাল হরণের যে অভিযোগ উঠেছে তার উৎস নিয়ে জনসাধারণের কৌতূহল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বিষয়টি নিয়ে যে কায়দায় রাহুল গান্ধি অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে তদন্তের দাবি করেছেন সেটাও আশ্চর্যজনক। এর পিছনে একটা কারণ হতে পারে এই যে, বিজয় মালিয়া ইউপিএ আমলেই সংসদের মনোনীত সদস্য হন। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু আগেই শেষ হয়ে যায় এবং তিনি বিজেপির অতি ঘনিষ্ঠবৃত্তে চলে আসেন। গোয়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠান কিংফিশারকে যে বিপুল সহায়তা ও বিজ্ঞাপনী সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার পিছনে এক অতি প্রভাবশালী মোদি-ঘনিষ্ঠ নেতার হাতযশের অভিযোগও রয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সম্ভবত মালিয়াকে মনোনয়ন দেওয়ার পাপ নিয়ে চর্চা চলুক এটা চায় না।

লক্ষণীয়, বিজয় মালিয়া এবং নীরব-চোকসি জুটিকে আগামী ভোটের আগে দেশে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্র অকস্মাৎ তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। সফল হলে ভোটের প্রচারে তাদের বিপুল ফায়দা। অন্যদিকে, নীরব মোদি, মেহুল চোকসির পর মালিয়াও গণমাধ্যমের আকর্ষণ হয়ে উঠতে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা শুরু করেছেন। সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারে যে, ঘোলা জল নয়, গভীর জলে মাছ শিকারের নিপুণ জাল তৈরি হচ্ছে নেপথ্যে।

অন্যদিকে, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর এবং মোদি সরকারের চক্ষুশূল রঘুরাম রাজন একটি তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন। সংসদীয় কমিটিকে ১৭ পাতার একটি চিঠিতে তিনি এটাও জানান, তিনি কর্মরত অবস্থায় ১০টি শীর্ষ ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির নাম জানিয়েছিলেন। মোদি সরকারের কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বরং অনাদায়ি ঋণ পর্বতপ্রমাণ বেড়েছে।

ইউপিএ-রাজের অবসানের সময় ব্যাংক জালিয়াতির অর্থমূল্য ছিল ২.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা। মোদি জমানায় তা হয়েছে ১২ লক্ষ কোটি টাকা। এই বিষয়ে ফেল করা ইউপিএ সরকারের পাশে সসম্মানে পাস করার দাবিদার এনডিএ সরকারের আমলের তথ্যটি ভয়ংকর। উৎসের জন্য দায়ী অযোগ্য ছাত্রের বিরুদ্ধে ওই হাতিয়ার কাজে লাগাচ্ছে না যোগ্যতম বর্তমানের কৃতী ছাত্র। আবার যোগ্য ছাত্রের আমলে ঋণের কলেবর ৪ গুণ বৃদ্ধির তথ্যটিও তেমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে কই? কোন পক্ষকেই বা কী বলা যাবে। সাধারণ মানুষ কাকে ছাড়বে, কাকে বাছবে সেটা ধন্ধই বটে!

অমৃতধারা

যে যথার্থ শিষ্য সে নীরবে শাসনবাণী শ্রবণ করে, সে কখনও উদ্ধত হইয়া আত্মসমর্পণ করে না। আদর্শ জীবনের শিক্ষাগ্রহণ করিবার আগে আমাদের অন্তর প্রকৃতিকে গভীর করিতে হইবে। ধৈর্য, দীনতা ও বাধ্যতা অভ্যাস, ইহাই আমাদের প্রয়োজন। এই কারণেই ভারতের ঋষিগণ শিষ্যকে প্রস্তুত করিবার শিক্ষায় কঠোর ছিলেন। যাহারা সামান্য তিরস্কার সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের সত্যিই বুদ্ধি কম এবং গভীরতার অভাব। শিষ্যত্ব গ্রহণ মানে ইহা যে এক পুণ্যব্রত তাহা স্বীকার করা। কেহ কেহ ইহার জন্য প্রস্তুত নয়। কাজেই প্রত্যেকে শিষ্য হইতে পারে না।

ক্ষুদ্র জীবনের স্বার্থ অন্বেষণ সত্যই মানুষের ক্ষতি করে। স্থির সংকল্প, প্রেম, নিঃস্বার্থ ভক্তি এবং ইষ্টের প্রতি অটল বিশ্বাস এই সমস্ত মঙ্গলপ্রসূ গুণই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। তুমি চেষ্টার সঙ্গে এসকল গুণের অনুশীলন করিও। তবেই তোমার সম্মুখে এক নতুন জগত খুলিয়া যাইবে। এই সকল গুণ স্বার্থ ক্ষেত্রে বাড়িতে পারে না। যেজন স্বার্থের দাস সে কখনও এই গুণাবলির সন্ধান পাইবে না। যাহারা অন্তর্মুখী হইয়াছে এবং অন্তরের নিগূঢ় আত্মার বাণী শুনিবার জন্য উন্মুখ তাহাদের মধ্যেই আমরা এই সকল গুণ দেখিতে পাই।

–স্বামী পরমানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২১০০

পাশাপাশি ঃ ১। সওদাগর, ব্যবসায়ী ৩। চতুষ্পদ বড়ো প্রাণী যা উত্তরবঙ্গের বনেও আছে ৫। বিনাশ, বৃহত্তর কোনো কিছুতে মিশে যাওয়া, নৃত্যগীতবাদ্যের সংগতি ৬। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৮। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১০। যে মন্ত্র পাঠপূর্বক হিন্দুগণ ঈশ্বরের আরাধনা করে, ওঁকার ১২। গাছের এক ডালের সঙ্গে অন্য ডালের ঘর্ষণে যে আগুন লাগে, বনাগ্নি ১৪। জঙ্গলে পূর্ণ বিস্তীর্ণ জলাভূমি, জঙ্গল ১৫। লক্ষ্মীদেবী, প্রীতিদায়িনী ১৬। আধুনিকা, তরুণী।

উপর–নীচ ঃ ১। প্রশংসা বা নিন্দাসূচক ধ্বনি, প্রশংসা করা, নিন্দা করা ২। জলের কল বসানোর বাঁধানো জায়গা ৪। সম বা তাল শেষ করার আগে বাদ্যযন্ত্রে তিন বার আঘাত, তিনভাগের এক ভাগ ৭। তিন ফোঁটাযুক্ত খেলার তাস ৯। মুগুর, মুদ্‌গরজাতীয় কিন্তু মুদ্‌গরের চেয়ে লম্বা এক ধরনের হাতিয়ার ১০। দানের বদলে দান, প্রতিশোধ ১১। সদ্ভাব, মনের মিল ১৩। কেনাবেচার জায়গাবিশেষ।

সমাধান ■ ২০৯৯

পাশাপাশি ঃ ১। সিকিম ৩। মাঙ্গলিক ৪। কবিতা ৫। মাইফেল ৭। টকি ১০। বশ ১২। সাতনর ১৪। তসর ১৫। হরিহর ১৬। দহলা।

উপর–নীচ ঃ ১। সিগারেট ২। মকর ৩। মাতামাতি ৬। ফেরেব ৮। কিরাত ৯। তরতর ১১। শশিকলা ১৩। করদ।

প্রতিহিংসা নয়, প্রচলিত রীতি মেনেই প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন রঞ্জন গগৈ

রঞ্জন গগৈ একজন কাজপাগল মানুষ। তিনি কাজে যেমন নিষ্ঠ, তেমনই কঠোর। সুপ্রিমকোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি পদে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, লিখেছেন **হরিহর স্বরূপ**।

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর কার্যকাল শেষ হওয়ার মুখে। আগামী ২ অক্টোবর তিনি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিতে চলেছেন। বিতর্কে জড়িয়েও তিনি সমস্ত বিরোধী চাপের সামনে ঋজু থেকেছেন এবং শেষপর্যন্ত নিজের পথ থেকে সরে আসেননি। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধীপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশন আনতে চাইলেও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইড়ু সেই মোশন বাতিল করে দেন। দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট মোশনের কোনও সারবত্তা নেই বলে নাইড়ু মনে করেন। তিনি বলেন, 'শাসনব্যবস্থার কোনো স্তম্ভকে দুর্বল করতে পারে এমন কোনো ভাবনা, কথা বা কাজকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না।'

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির কাজের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। তাদের মনে হয়, প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র প্রকারান্তরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের পক্ষে কাজ করছেন। এ ব্যাপারে বিজেপির এক প্রবীণ নেতার বক্তব্য, দীপক মিশ্র আমাদের প্রধান বিচারপতি এবং ভারতীয়দের অবশ্যই উচিত তাঁর পদের মর্যাদা দেওয়া। প্রধান বিচারপতি এমন কিছু রায় দিয়েছেন যা বিরোধীদের পক্ষে যায়নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রধান বিচারপতি সঠিক বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করছেন না। শুধুমাত্র বিপক্ষে রায় গিয়েছে বলেই প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এত গুরুতর অভিযোগ আনা যায় না। প্রধান বিরোধী দল সুপ্রিমকোর্টের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছে, যাতে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে শীর্ষ আদালত তাদের বিপক্ষে রায়দান থেকে বিরত থাকে। '১৯-এর নির্বাচনের আগে সুপ্রিমকোর্ট যাতে অযোধ্যা ইশ্যুতে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেয় সেজন্য প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল আদালতে পিটিশনও দিয়েছেন।

ওড়িশার বিখ্যাত কংগ্রেসি পরিবার থেকে দীপক মিশ্র উঠে এসেছেন এটা সবাই জানেন। তাঁর ঠাকুরদা গোদাবরীশ মিশ্র স্বাধীনতার আগে ওড়িশা সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। কাকা লোকনাথ মিশ্র ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। বিজেপির সেই প্রবীণ নেতার মতে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিপক্ষ মতামত গ্রহণ করেন না। আবার এঁরাই ইয়াকুব মেমনের জন্য সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দেন, অন্যদিকে শীর্ষ আদালত যখন তিন তালাক নিয়ে রায় দেয় তখন সেটাকে ইশ্যু তৈরি করেন। নিজেদের বিপক্ষে রায় হলেই তথাকথিত নাগরিক সমাজ চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেয়। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য অনেকটা এরকমই।

চলতি বছর ১২ জানুয়ারি বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং তাঁর তিন সহকর্মী বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, এম বি লকুর এবং কুরিয়ান জোসেফ সাংবাদিক সম্মেলন করে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। তাঁরা গুরুতর কিছু অভিযোগ আনেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, প্রধান বিচারপতি গুরুত্বপূর্ণ মামলা সিনিয়র বিচারপতিদের না দিয়ে জুনিয়ার বিচারপতিদের দিচ্ছেন। জানুয়ারির সেই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে মামলা বণ্টন ছাড়াও দুর্নীতি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়েও অভিযোগ তোলা হয়। এসবের পর মনে করা হচ্ছিল পরবর্তী প্রধান বিচারপতি পদের জন্য খুব সম্ভবত রঞ্জন গগৈকে মনোনীত করা হবে না। কিন্তু শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দীপক মিশ্র বরাবরের রীতি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন না। রঞ্জন গগৈ সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও দীপক মিশ্র পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নামই প্রস্তাব করেছেন।

রঞ্জন গগৈ কথা কম বলেন। কিন্তু কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠ এবং কঠোর বলেই পরিচিত। অসমের ডিব্রুগড়ে তাঁর জন্ম। পড়াশোনা এবং বেড়ে ওঠা সেখানেই। ১৯৭৮ সালে গুয়াহাটি হাইকোর্টে তিনি আইন পেশায় যোগ দেন। ২০০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১০ সালে তিনি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলি হন। ২০১২ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হন। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এই প্রথম কেউ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে চলেছেন। রঞ্জন গগৈয়ের বাবা কেশবচন্দ্র গগৈ ছিলেন অসমের প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মা শান্তি গগৈ একজন সমাজকর্মী। দক্ষিণ দিল্লিতে বাজার থেকে তাঁকে প্রায়ই মাছ কিনতে দেখা যায়। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিকে বাজার থেকে মাছ কিনতে দেখে অবাক হয়ে যান মাছ বিক্রেতারা। সহকর্মীরা তাঁকে একজন কাজপাগল মানুষ বলেই জানেন, একইসঙ্গে মনোযোগী পাঠক। এত সূক্ষ্মভাবে খুঁটিয়ে তিনি মামলার ফাইলগুলো দেখেন, আইনজীবীরাও বিস্মিত হন। তাঁর নিজের কোনো গাড়িও নেই।

সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বেঞ্চে বেশকিছু মামলার শুনানি চলছে। অসমের এনআরসি পরিবর্তনের ওপর নজরদারির দায়িত্বে যে বেঞ্চ রয়েছে তার শীর্ষে রয়েছেন রঞ্জন গগৈ। লোকপাল ও লোকায়ুক্ত গঠনের অগ্রগতি দেখার জন্য বেঞ্চের নেতৃত্বেও তিনি রয়েছেন। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ও দিয়েছেন বিচারপতি গগৈ। সম্প্রতি তিনি বলেন, 'বিচারবিভাগকে সাধারণ মানুষের জন্য সক্রিয় রাখতে সংস্কার নয়, চাই বিপ্লব।' বিচারব্যবস্থাই যে আশার শেষ বিন্দু সেকথাও বলেন তিনি। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতিই প্রধান বিচারপতি হওয়ার সুযোগ পান। সেই হিসেবে দীপক মিশ্রর পরই বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নাম ছিল। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ অন্য। জানুয়ারিতে যে চার বিচারপতি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, মামলা বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে নজিরবিহীনভাবে সরব হন, বিচারপতি রঞ্জন গগৈ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেজন্য গগৈকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে দীপক মিশ্র বাছবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। জল্পনাও চলছিল। কিন্তু শীর্ষ আদালতে বিচারপতি রঞ্জন গগৈকেই প্রধান বিচারপতি পদে দেখতে চান সুপ্রিমকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। আইনমন্ত্রক কিছুদিন আগে প্রধান বিচারপতিকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতির নাম প্রস্তাবের জন্য চিঠি পাঠালে দীপক মিশ্র সরকারের কাছে রঞ্জন গগৈয়ের নাম প্রস্তাব করেছেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে লিখিতভাবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন দীপক মিশ্র। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সেই সুপারিশ মেনে নেওয়ায় আগামী ৩ অক্টোবরই সুপ্রিমকোর্টের ৪৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন গগৈ। ২০১৯-এর ১৭ নভেম্বর তাঁর অবসর নেওয়ার কথা।

ঘরে ও বাইরে এক হই-হট্টগোল ও চাপের সময়ে রঞ্জন গগৈ দায়িত্ব নিতে চলেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর অধীনে যেমন বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি চলছে, পাশাপাশি আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ও তাঁকে দিতে হতে পারে।

> রঞ্জন গগৈয়ের বাবা কেশবচন্দ্র গগৈ ছিলেন অসমের প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মা শান্তি গগৈ একজন সমাজকর্মী। দক্ষিণ দিল্লিতে বাজার থেকে তাঁকে প্রায়ই মাছ কিনতে দেখা যায়। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিকে বাজার থেকে মাছ কিনতে দেখে অবাক হয়ে যান মাছ বিক্রেতারা।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

স্বামীজি ছিলেন সহিষ্ণুতা ও মানবপ্রেমে বিশ্বাসী

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে এক মহান বার্তা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বিবাদ নয়, সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'। তিনি খুব দুঃখ করে বলেছিলেন, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি অর্থাৎ মতান্ধতা বারবার এই পৃথিবীকে রক্তে প্লাবিত করেছে, সভ্যতাকে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। তাই এর থেকে সমাজকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে হবে। যত মানুষ পৃথিবীতে, ততগুলি সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু ভয় হচ্ছে সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িকতা তাকে নিয়ে। স্বামীজি শুধু সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস রাখেননি তিনি জোর দিয়েছিলেন গ্রহিষ্ণুতায়। কারণ এখানে কোনো আত্মম্ভরিতা বা উন্নাসিকতা থাকে না। স্বামীজির আর একটি লক্ষ্য ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে আমেরিকার পার্থিব জ্ঞান আহরণ করা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এরকম একটি বিনিময়ের কথা ভেবেছিলেন।

এক পত্রে স্বামীজি লেখেন, ভারতে দরিদ্রদের কোনো সুযোগ নেই, নিস্তার নেই, কোনো পথ নেই উপরে ওঠার। প্রতিদিন তারা আরও নীচে নেমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পর যুগপুরুষ স্বামীজির বিখ্যাত 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' বক্তৃতামালা দেশের আপামর মানুষকে উদ্বেলিত করে তুলল। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যেন আত্মমর্যাদাবোধ বহুগুণ বেড়ে গেল। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এর অসামান্য প্রভাব দেখা যায়। বাংলার বিপ্লবীরা গভীরভাবে স্বামীজির দ্বারা প্রভাবিত হলেন। তাঁর লেখা বই বিপ্লবীদের শুধু অবশ্যপাঠ্যই ছিল না, ইংরেজ পুলিশ প্রায় সমস্ত বিপ্লবীদের কাছ থেকে স্বামীজির লেখা বই উদ্ধার করত।

বোস্টন শহরের একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়– স্বামীজি মূলত ভারতের অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের কথাই বিশেষ করে বলেছেন। ভারতের কোনো কোনো স্থানে বহু দরিদ্র মানুষ মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খেয়ে জীবনধারণ করে। কোনো বছর ধান না ফললেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাই ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে লোক না পাঠিয়ে (যা ভারতে যথেষ্ট আছে) কারিগরি শিক্ষা দিতে পারবেন এমন ব্যক্তি পাঠালে ভালো হয়। ভারতীয়রা শিল্পজ্ঞান শিখে স্বনির্ভর হোক স্বামীজি তাই চাইতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জে আর ডি টাটাকে স্বামীজি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা না করে ভারতে শিল্পস্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ইতিহাসে এমন স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী সত্যিই বিরল। জনসাধারণকে শিক্ষিত করা ও উন্নত করাই যে জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা, একথা স্বামীজি বারবার বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন।

তিনিই প্রথম বলেন, 'দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছতে না পারে তবে, তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় যাইতে হইবে'।

শিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজিকে নিয়ে মাতামাতির পর্বে আমরা দেখি তিনি দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় না শুয়ে মাটিতে শুয়েছেন। চোখের জল ফেলেছেন ভারতের অগণিত হতদরিদ্র মানুষের কথা ভেবে। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর মানবপ্রেম। এক মার্কিন লেখিকা ইলিনর স্টার্ক, আমেরিকায় স্বামীজির প্রভাব সম্পর্কে এক অসাধারণ বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, স্বামীজি আমেরিকাকে অমূল্য যে দর্শন উপহার দিয়ে গেছেন সেটা এবার সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত আমেরিকার খুলে দেখার সময় এসেছে। এ কথাটা মনে হয় সর্বতোভাবে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

এটা একটা শাস্তিমুক্ত সমাজ !

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি হাসপাতালের লিফটে এক সন্তানসম্ভবা মহিলার প্রায় আধঘণ্টা–চল্লিশ মিনিট আটকে থাকবার খবরে কোনো আলোড়ন ঘটেনি, সংবাদমাধ্যমে একটি ছোট্ট প্রতিবেদন প্রকাশ ছাড়া ! লিফটম্যান, হাসপাতাল সুপার, চিকিৎসক, নার্স, বিদ্যুৎ দপ্তরw, পূর্তদপ্তরের কতটা অবহেলা থাকলে লিফটে আটকে থাকবার মতো মারণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় !

চরম আতঙ্কের মধ্যে বন্দিনী সেই মহিলাই এক্ষেত্রে একক নন, হাওড়ার এক হাসপাতালে এক গৃহবধূও প্রায় উনিশ কুড়িটি ছুরিকাঘাত নিয়ে সেই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হাসপাতালের লিফটে আটকে পড়েন ! সেই অভিশপ্ত লিফটের চালক, বিদ্যুৎ দপ্তর, চিকিৎসা কর্মী–কারও তো কোনো শাস্তি হয়ইনি এমনকি কার দোষে এই ধরনের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধগুলো ঘটে যায়, তা নির্ধারণও করা হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ক্ষমাহীন অপরাধের জন্য যারা দায়ী তাদেরকে শাস্তি দেবে কারা ? তাদের সর্বোচ্চ আধিকারিকেরা ? হাসপাতাল সুপার, পুলিশ, ডিএম, এসডিপিও ? এটা একটা শাস্তিমুক্ত সমাজ, যেখানে আধিকারিকরা কেবলই রাজনৈতিক প্রভুদের সামনে নতজানু হয়ে থাকবেন ? রাজপ্রভুদের মিষ্টি কথা বলে তুষ্ট করাই কি আমলাদের কাজ ? আর রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশ ছাড়া যেহেতু গাছের পাতাও নড়ে না, তাই প্রশাসনের অভ্যন্তরে গাফিলতি, অবহেলা এবং অন্তর্ঘাতের কোনো সুরাহা হয় না।

কেরলের বন্যা নিয়ে এক সংবাদপত্র প্রশ্ন তুলেছে, ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি) যারা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে ভীষণই সমৃদ্ধ তারা কি মুল্লাপেরিয়ার বাঁধ কিংবা ইকুডি বাঁধে সঞ্চিত বিশাল পরিমাণ জলস্রোত নিয়ে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনকে আগে সতর্ক করেছিল ? অথবা এই অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সিডব্লুসি কি নড়েচড়ে বসেছিল ? কেরলে এই ধরনের বিপদের পূর্বাভাস সত্ত্বেও, কি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

অধ্যাপক শান্তনু বসু
চাঁচল কলেজ।

ধন্য মাতাপিতা

গত ১০ সেপ্টেম্বর একটি খবর পড়ে খুবই ভালো লাগল। জলপাইগুড়ি জেলার হেলাপাকড়িতে সেন পরিবার তাদের মা বাবাকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে আসছে বিগত ১৩ বছর ধরে। আজকের সমাজে এটা একটা বিরল দৃষ্টান্ত। বর্তমান সমাজে প্রায়ই আমরা দেখে আসছি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নানা খবর। কোথাও বাবা-মায়ের উপরে শারীরিক অত্যাচারের খবর, কোথাও বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হচ্ছে, কোথাও বৃদ্ধা বাবা ও মা রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আবার কোথাও কলেজের অধ্যাপক ছেলে তার অসুস্থ মাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। যেটা আমরা কয়েকমাস আগে দুরদর্শনের পর্দায় দেখেছিলাম। উপোরক্ত ঘটনাগুলি সবই শিক্ষিত পরিবারেই হয়ে থাকে।

কিন্তু হেলাপাকড়ির এই সেন পরিবারের সন্তানরা বেশি শিক্ষিত নয় অথচ তাদের মনের ভিতরে মাতাপিতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। পাঠ্যবইতে পড়েছি। 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' এবং 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। কিন্তু তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে সেন পরিবারে। ঈশ্বররূপী মাতাপিতা তাঁদের সন্তানদের অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন। এইসব ছেলেমেয়েদের দেখে সমাজের অন্য ছেলেমেয়েদেরও অন্তরাত্মা জাগ্রত হবে আশা করি। ধন্য মাতাপিতা এমন সন্তানদের জন্ম দেবার জন্য। সমাজের প্রতি ঘরে ঘরে এমন সব সন্তান জন্ম নিক এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করুক।

দুলাল সাহা
সুভাষ লেন, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

প্যাঁচফোড়ন

সাপ হয়ে দংশে ওঝা হয়ে ঝাড়ে

উত্তরায়ণ দেব

'একই অঙ্গে এতো রূপ, দেখিনি তো আগে'! মামু একে গিরগিটি ভাববেন না মাইরি। বহুত সহ্য করেছি ভাই, এবার হেস্তনেস্ত হওয়াটা দরকার। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তান্ত্রিকতারই রমরমা, সর্বত্রই ঝাড়ফুঁক মানে ঝেড়ে ফাঁক ! কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে সরকারই প্রজার ঝেড়ে ফাঁক করলে, কেস গণ্ডগোলের গন্ধ ! এ তুমি কেমন রাজা ! এটা তো কথা ছিল না বন্ধু !

আসলে সিস্টেমের গোড়ায় গলদ। তাই 'রাজা আসে রাজা যায়' প্রজার হাল বদলায় না। রাজসিংহাসনের হেভ্যি ডিমান্ড। ফুটবল খেলার নিয়মে একটা বল নিয়েই ২২ জন কাড়াকাড়ি করে। 'আহা দিয়ে দাও' বলে ২২ জন প্লেয়ারকে ১টা করে বল দিলে খেলাটাই যেমন ভণ্ডুল হবে, তেমনই রাজসিংহাসনের আবেদনকারী সকলকে একটা করে সিংহাসন বানিয়ে দিলে কেস 'ঘেঁটে-ঘ' হবে। কারণ এই সিংহাসন হল মসনদ। মসনদে বসতে প্রজার মঙ্গল সাধনের ঢপের প্রতিশ্রুতি কে, কতটা, কীভাবে দিল তার ওপর এর প্রাপ্তি নির্ভর করে। তাই সিংহাসন পেতে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচুর কাঠ আর খড় পোড়াতে হয়। এই কাঠ-খড় কিনতে প্রচুর মাল্লু লাগে। 'লাগে টাকা দেবে গৌরি সেন'রা টাকার খলি নিয়ে তৈরিই থাকে। শুধু 'আ-তু-তু' ডাকলেই, লেজ নাড়িয়ে মাল্লু দিয়ে যাবে। তারপর সিংহাসন হাতিয়ে সেই মাল্লু সুদ সমেত শোধ করতে হয়, সরাসরি নয়তো ঘুরপথে। বেচার জন্য ভোটার পাবলিক তো আছেই। গণতন্ত্রের মলাটের আড়ালে প্রজা নিধন চলতে থাকে তড়িৎগতিতে। কারণ হাতে মাত্র পাঁচ বছর। আগামীতে ফিরে আসার গ্যারান্টি নেই। সুতরাং এই মওকায় যা পারো, যেভাবে পারো লোট আর লুটতে দাও।

'জন্মিলে মরিতে হবে' আর মরিবার আগে ভুগিতে হবে। তাই স্বাস্থ্যই সম্পদ ! হু হু বাওয়া কি বললুম বোঝেননি। আপনার স্বাস্থ্য 'ওদের' সম্পদ। কারণ 'ওরা' জানে আপনি ঘটিবাটি বেচেও নিজেকে, পরিবারকে সুস্থ রাখতে চাইবেন। সুতরাং আপনাকে কাটার জন্য আপনার স্বাস্থ্যের চেয়ে সহজলভ্য আজকের বাজারে কিছু নেই। সুতরাং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নামে পাবলিক ধরো আর কোপাও। সরকার দেখেও দেখছে না। কারণ ওই যে, মসনদে বসবার ঋণ চোকাতে হচ্ছে। ফলে নানান 'কেরামতি'-তে সরকারের ক্রয় করা পেট্রোল বাজারে দ্বিগুণেরও বেশি দামে বিক্রি হয়। পেট্রোল থাক আগুন লেগে যাবে, আমরা বরং শ্মশানের দিকে যাই, যেখানে স্বাস্থ্য পরিসেবার নামে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে পাবলিককে খাল্লাস করা হচ্ছে। জায়গার অপ্রতুলতায় কসাইখানা সরি নার্সিংহোমের প্রসঙ্গে গেলাম না। অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

হিন্দিতে 'দাওয়া-দারু' দুটো ভিন্ন শব্দকে কেন পাশাপাশি উচ্চারণ করা হয় সম্প্রতি টের পেলাম। দারু বা মদ বিক্রি থেকে সরকারের ভাঁড়ারে ও কর্মীদের পকেটে প্রচুর রেস্ত আসে এটা অনেকেই জানে। এবারে আসি দাওয়া বা ওষুধ প্রসঙ্গে। সরকারের 'ড্রাগ কন্ট্রোল' নামে একটা বিভাগ আছে, যারা দেশের ওষুধ বিক্রি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারের সমস্ত ওষুধের দোকান এদের সেলাম ঠোকে। পাশাপাশি জনহিতে সরকারের নিজেরও ওষুধের দোকান আছে, যেখানে 'ন্যায্যমূল্যে' ওষুধ বিক্রি হয়। বাইরের বাজারে যে অ-ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হয় এতেই বোঝা যায়। কতটা অন্যায্য সেই অভিজ্ঞতাটা জানাই। হৃদয়ের কারণে প্রতি মাসে বাজার থেকে প্রায় ৬০০ টাকার ওষুধ কিনে অভ্যস্ত। সেই একই পরিমাণ ওষুধ সরকারি এইমস্-এর কাউন্টার থেকে মাত্র ৮৪ টাকায় পেলাম। গায়ে চিমটি কেটে বিশ্বাস করতে নেট ঘেঁটে দেখে নিলাম সঠিক ওষুধ কিনা। সন্দেহ দূর হতেই মনে একটা বড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল। যে ওষুধ ৮৪ টাকায় পাবলিকের হাতে তুলে দেওয়া যায়, সেই একই ওষুধ বাইরের বাজারে যখন ৫০০ টাকার ওপরে বিক্রি হয়, তখন কোথায় থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ! বেশি টাকা দিয়ে ওষুধ কেনার অক্ষমতায় না জানি কত মানুষ রোগে ভুগে মারা গিয়েছে।

আরে ধুর পাগলা চেপে যা ! মসনদে বসার ঋণ চোকানো চলছে যে। 'জিও অউর জিনে দো', কামাও আর কামাতে দাও। ন্যাপলা নিজে যখন কোপায় তখন সেটা খুন কিন্তু সরকারি পোশাক গায়ে সেই ন্যাপলাই যখন খুন করে, তখন সে খুনের লাইসেন্সধারী। ক্ষমতাবান চোর, জোচ্চোরদের রাজত্বে এমনিতেই পাবলিক জিন্দা লাশ। ট্যাফোঁ করলেই পড়বে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। জিও গণতন্ত্র !